আন্না উলিয়ানভা
লেনিন :
শৈশব
ও
কৈশোর

আন্না উলিয়ানভা

লেনিন: শৈশব ও কৈশোর

অনুবাদ: মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়
ছবি এঁকেছেন ইউ. রাকুতিন

'রাদুগা' প্রকাশন • মস্কো

প্রথম পরিচ্ছেদ

ভ্লাদিমির ইলিচ উলিয়ানভ (লেনিন)-এর জন্ম হয় ১৮৭০ সালের ২২ এপ্রিল তারিখে ভলগা-তীরবর্তী শহর সিম্‌বির্স্কে। পরে লেনিনের সম্মানে শহরটির নতুন নামকরণ হয় উলিয়ানভ্‌স্ক।

ওই সময়ে ভ্লাদিমিরের বাবা ইলিয়া নিকোলায়েভিচ ছিলেন সিম্‌বির্স্ক গুবের্‌নিয়ার (বা জেলার) স্কুল-ইন্‌স্পেক্টর। অতি সাধারণ ঘরে তাঁর জন্ম হয়েছিল এবং অত্যন্ত অল্পবয়সে তিনি পিতৃহীন হন। বড় ভাইয়ের সাহায্যে কোনোক্রমে লেখাপড়া শেখার সুযোগ ঘটে তাঁর। বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ শেষ করে প্রথমে পেন্‌জায় ও পরে নিজ্‌নি-নভ্‌গরদে শিক্ষকতা করেন। ছাত্রদের মধ্যে অত্যন্ত জনপ্রিয় শিক্ষক ছিলেন তিনি, কখনও তাদের শাস্তি দেয়া অথবা প্রধান শিক্ষকের কাছে তাদের নামে নালিশ করা এসব করেন নি; শিক্ষক হিসেবে তিনি ছিলেন সর্বদাই ধৈর্যশীল, পাঠ্যবিষয় ছাত্রদের সহজ করে বুঝিয়ে দিতে দক্ষ, তাছাড়া প্রতি রবিবার পড়াশুনোয় পিছিয়ে-পড়া ছাত্রদের ও যাদের বাড়িতে পড়া বলে দেবার কেউ নেই তাদের বিনা পয়সায় পড়াতেন। পরবর্তী জীবনে তাঁর ছাত্ররা সর্বদাই তাঁর কথা স্মরণ করেছেন একান্ত ভালোবাসা ও কৃতজ্ঞতাবোধের সঙ্গে। সিম্‌বির্স্কে দরিদ্র ও কৃষকদের ছেলেমেয়েদের জন্যে আরও বেশি সংখ্যায় ইশ্‌কুল স্থাপনের প্রয়াস পেয়েছিলেন তিনি এবং এ-কাজে সময় ব্যয় করতে, কর্মশক্তি ও সামর্থ্য নিয়োগ করতে, বছরের সকল ঋতুতে জেলার সর্বত্র সফর করে বেড়াতে কিছুমাত্র কার্পণ্য করেন নি।

ভ্লাদিমিরের মা মারিয়া আলেক্সান্দ্রভ্‌না ছিলেন ডাক্তারের মেয়ে। যৌবনের বেশির ভাগ সময় তিনি গ্রামাঞ্চলে কাটিয়েছিলেন এবং কাছাকাছি অঞ্চলের কৃষক-পরিবারগুলি সর্বদাই ছিল তাঁর অনুরক্ত। তিনি ছিলেন ভারি সঙ্গীতানুরাগী এবং ফরাসি, জার্মান, ইংরেজি ভাষাও জানতেন। সঙ্গীতশিক্ষা ও বিদেশী ভাষাচর্চায় নিজের ছেলেমেয়েদেরও তিনি দীক্ষা দিয়েছিলেন। সামাজিক উৎসব ও আমোদপ্রমোদে তাঁর মন ছিল না, প্রায় সমস্ত সময়টাই ছেলেমেয়েদের নিয়ে ব্যস্ত থাকতেন ও বাড়িতে কাটাতেন। ফলে ছেলেমেয়েরাও তাঁকে যেমন গভীরভাবে ভালোবাসত তেমনই শ্রদ্ধা করত। তাদের বাগ মানাতে বা কোনো কাজে নিযুক্ত করার পক্ষে তাঁর শান্ত, মিষ্টি একটি কথাই ছিল যথেষ্ট। স্ত্রীর মতো ইলিয়া নিকোলায়েভিচও তাঁর অবসর-সময় পরিবারের সঙ্গে কাটানো — ছেলেমেয়েদের

পড়ানো, তাদের খেলায় যোগ দেয়া কিংবা তাদের গল্প বলা — বেশি পছন্দ করতেন।

এই ঘন-সন্নিবিষ্ট পারিবারিক পরিবেশে বড় হয়ে ওঠে ভ্লাদিমির। সে ছিল বাড়ির তৃতীয় সন্তান, হৈ-হল্লায় ওস্তাদ দুরন্ত ছেলে। চঞ্চল, খুশি-ঝলমলে, হালকা বাদামিরঙের চোখদুটো তার ঘুরত সর্বত্র।

বাচ্চা ভ্লাদিমির আর তার দেড় বছরের ছোট বোন ওলিয়াই ছিল বাড়ির মধ্যে সবচেয়ে হাসিখুশি আর প্রাণবন্ত দুই বাচ্চা। হৈ-চৈ দৌড়োদৌড়ি করে খেলতে ভালোবাসত তারা, বিশেষ করে ভ্লাদিমির তো বটেই। সাধারণত সে-ই ছোট বোনকে হুকুম করত আর দৌড় করাত। বোনকে তাড়া করে সে সোফার নিচে ঢোকাত আর তারপর ফের হুকুম জারি করত: 'বেরিয়ে আয় শিগ্গির!'

ভ্লাদিমির যেখানে যেত হাসিখুশি আর হৈ-হল্লায় ভরে উঠত সেই জায়গাটা। একবার গ্রীষ্মের ছুটিতে আমাদের পরিবার স্টিমারে করে কাজান জেলার একটা গ্রামে যাওয়ার সময়ও এর ব্যতিক্রম ঘটে নি।

স্টিমারে যেতে-যেতে মা ওকে বললেন: 'ভ্লাদিমির, অত জোরে চেঁচিও না এখানে, কেমন?'

জবাবে বিনা দ্বিধায় গলা ছেড়ে চিৎকার করে ভ্লাদিমির জবাব দিল: 'কিন্তু ইস্টিমার যে জোরে চ্যাঁচাচ্ছে, তার বেলা?'

ভ্লাদিমির বা ওলিয়া বেশি দুষ্টুমি করলে মা করতেন কী, বাবার লেখাপড়ার ঘরে ওদের নিয়ে গিয়ে তাঁর একটা আরামকেদারায় বসিয়ে দিয়ে ওদের শান্ত করতেন। ওরা চেয়ারখানার নাম দিয়েছিল — 'ভয়ংকর আরামকেদারা'। মা যতক্ষণ-না হুকুম দিতেন ততক্ষণ ওই চেয়ার ছেড়ে নড়া কিংবা খেলতে যাওয়ার যো ছিল না ওদের। একদিন ভ্লাদিমিরকে মা ওই 'ভয়ংকর আরামকেদারা'টায় বসানোর পর অন্য কী-একটা কাজে কেউ তাঁকে ডেকে নিয়ে যায় আর তিনি ভ্লাদিমিরের কথা বেমালুম ভুলে যান। বেশ কিছুক্ষণ পরে যখন তাঁর হঠাৎ খেয়াল হয় যে অনেকক্ষণ ধরে তিনি ভ্লাদিমিরের গলা শুনছেন না তখন পড়ার ঘরে গিয়ে দেখেন ভ্লাদিমির সেই 'ভয়ংকর আরামকেদারা'টায় শুয়ে গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে আছে।

ভ্লাদিমির খেলনা-পুতুল নিয়ে বিশেষ খেলাধুলো করত না। খেলনা পেলেই ভেঙে ফেলা বাতিক ছিল তার। যখন আমরা, বড় ভাইবোনেরা, তাকে এ-কাজে বাধা দিতাম সে তখন আমাদের কাছ থেকে পালিয়ে বেড়াত বা লুকিয়ে পড়ত। তার এক জন্মদিনে ধাই-মা'র কাছ থেকে কাগজের মণ্ডের তৈরি একটা ত্রোইকা (তিন-ঘোড়ার গাড়ি) উপহার পাবার পর সেদিন সে এমনি লুকিয়ে পড়েছিল,

এখনও মনে পড়ে। কোথায় গেল ছেলে খুঁজতে গিয়ে অল্পক্ষণের মধ্যেই দেখা গেল একটা দরজার পাল্লার আড়ালে দাঁড়িয়ে সে নিঃশব্দে মনোযোগ দিয়ে তিনটে ঘোড়ার পা-ই প্রাণপণে মুচড়ে-মুচড়ে ভাঙছে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ভ্লাদিমিরের যখন পাঁচ বছর বয়স মায়ের তত্ত্বাবধানে তখনই সে পড়তে শেখে। বাবা যে-সমস্ত শিশুপাঠ্য বই আর পত্রপত্রিকার গ্রাহক হতেন ভ্লাদিমির আর ওলিয়া সে-সমস্ত গোগ্রাসে গিলত ঘণ্টার-পর-ঘণ্টা। এরপর শিগ্‌গিরই ওরা রুশ ইতিহাসের গল্প পড়া আর পদ্য মুখস্থ করা শুরু করল। তবে পদ্য পড়তে ওলিয়াই ভালোবাসত বেশি। অনেক লম্বা-লম্বা আর কঠিন কবিতাও সে মুখস্থ করে ফেলেছিল আর সে-সব আবৃত্তিও করত প্রবল অঙ্গভঙ্গি সহকারে।

ভ্লাদিমিরের যখন প্রায় আট বছর বয়স তখন 'গরিব কৃষকের গান' কবিতাটি তার সবচেয়ে প্রিয় ছিল। প্রবল উৎসাহে সে তখন যখন-তখন আবৃত্তি করত:

> বড়লোকে সারা রাত্তির ভয়-ভাবনায় ভোগে
> ঘড়া-ঘড়া টাকা আগলে পাশে,
> আর ছেঁড়া কাঁথায় খুশির গানে মাতে গরিব লোকে —
> পোশাক টুটাফুটায় কী যায়-আসে!

কবিতাটি ভারি পছন্দ ছিল তার।

একেবারে ছেলেবেলায় অবশ্য বই পড়তে যে সবচেয়ে ভালো লাগত তার তা নয়। 'শিশুপাঠ' নামের সাময়িক পত্রিকাখানি পড়তে ভালোবাসত বটে, তবে কিছুক্ষণ পড়ার পরই সে উঠে পড়ত আর ছোট বোনের সঙ্গে হৈ-চৈ করে দৌড়োদৌড়িতে আর খেলায় মশগুল হয়ে উঠত। গ্রীষ্মকালে ওরা দু'জন বাড়ির উঠোনে কিংবা বাগানে দৌড়োদৌড়ি করে বেড়াত, গাছে চড়ত আর নয়তো লুকোচুরি খেলতে লেগে যেত। আর তখন আমরা দুই বড় ভাইবোনও ওদের খেলায় যোগ দিতাম। এই লুকোচুরি খেলাটা ভ্লাদিমির তখন প্রায়ই খেলতে চাইত, তবে আরেকটু বড় হয়ে তার ঝোঁক পড়ে কাঠের বল নিয়ে 'ক্রোকে' খেলার দিকে। আমাদের উঠোনে তৈরি-করা একটা ঢালু জায়গা বেয়ে শীতকালে বাচ্চাদের চাকাবিহীন স্লেজগাড়িতে চেপে গড়িয়ে নামা কিংবা বন্ধুদের সঙ্গে মিলে তুষারের
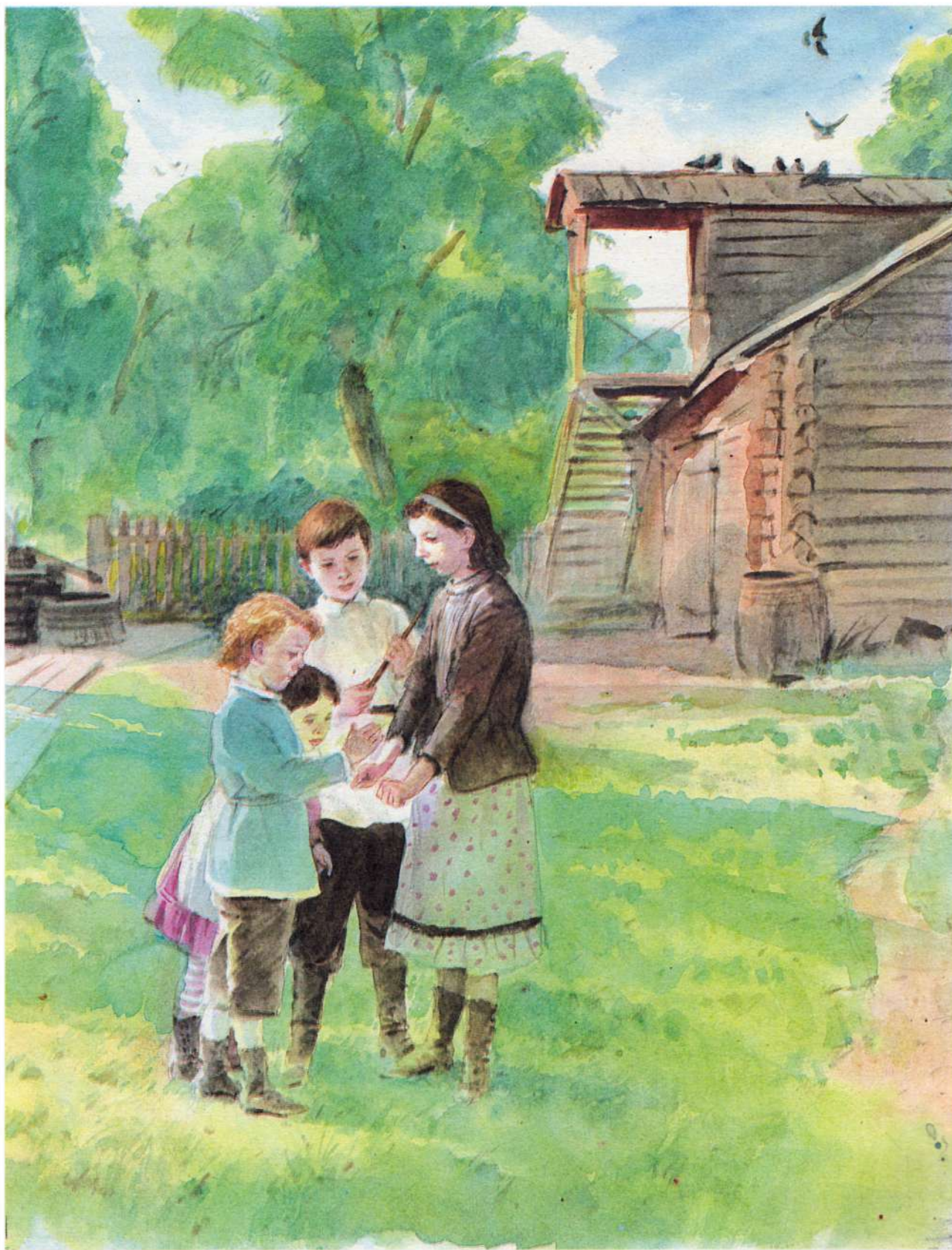
গোলা ছোড়াছুড়ি করা ছিল তার প্রিয় খেলা, তবে আরেকটু বড় হবার পর বাইরে গিয়ে স্কেটিং করাই ছিল তার পছন্দ।

ভ্লাদিমির আর আমাদের সবচেয়ে বড় ভাই আলেক্সান্দরকে সিম্‌বিস্কের্র সর্বসাধারণের স্কেটিং-রিঙ্কের কাছাকাছি একটা উঁচু পাহাড় থেকে স্কেট করে নামতে দেখেছি, মনে পড়ে। পাহাড়টা এত খাড়া ছিল যে প্রথম-প্রথম ওই খাড়াই বেয়ে আমাদের এমনকি স্লেজে চেপে নামতেও ভয় করত। পাহাড়টার চুড়োর দিকটা ছিল সবচেয়ে খাড়া, আর সেখান দিয়ে নামবার সময় আমাদের ভাইদুটো সাংঘাতিকভাবে ধনুকের মতো বেঁকে নামত, তারপর দৌড়ের বেগ বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ক্রমশ সোজা হয়ে উঠত, অবশেষে রিঙ্কের মসৃণ সমতল মাঠে নেমে আসার পর পিছলে-পিছলে দৌড়ত অনেকক্ষণ ধরে। ওদের এই স্কেটখেলা ঈর্ষাতুর চোখে তাকিয়ে-তাকিয়ে দেখতাম আমি, কিন্তু কোনোদিন ওদের মতো স্কেটিং করার ব্যাপারে মনস্থির করে উঠতে পারি নি। আমার মনে হয় ভ্লাদিমির আলেক্সান্দরের চেয়ে আরও সাবলীলভাবে পাহাড় থেকে নামত। সে ছিল বেঁটেখাটো, গাঁট্টাগোট্টা ছেলে। তবে ইশ্‌কুলে যাওয়া শুরু করার পর থেকেই সে স্কেটিং শেখে।

আগেই বলেছি, ভ্লাদিমির ছিল দুরন্ত-দুষ্টু আর দুষ্টুমির কিছু-একটা মতলব সবসময় মাথায় ঘুরত তার। কিন্তু তার চরিত্রের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য ছিল সত্যভাষণ। দুষ্টুমি করতে গিয়ে অন্যায় কিছু করলে সবসময়েই স্বীকার করত তা। যখন তার বয়স পাঁচ বছর তখন একদিন তার বড় বোনের সদ্য-পাওয়া রুলকাঠিটি সে ভেঙে ফেলে। পরক্ষণেই ভেঙে-ফেলা রুলকাঠিটি নিয়ে দৌড়ে দিদির কাছে গিয়ে দোষ স্বীকার করে সে। আর দিদি যখন জিজ্ঞেস করে কী করে কাঠিটি ভাঙল তখন ভ্লাদিমির নিজের একটা হাঁটু উঁচু করে তুলে দেখিয়ে বলে: 'এমনি করে হাঁটুর ওপর চাপ দিয়ে ভেঙেছি।'

মা প্রায়ই বলতেন: 'ও-যে কোনোকিছু লুকিয়ে করে না এতেই আমি খুশি।'

একবার তিনি একদিনের একটা ঘটনার কথা আমাদের বলেছিলেন। আপেলের পুর-দেয়া পিঠে বানাবার জন্যে একদিন তিনি রান্নাঘরে আপেল কুচোচ্ছিলেন আর কুচনো আপেল ডাঁই করে জমা করছিলেন টেবিলের ওপর। ভ্লাদিমির সে-সময়ে রান্নাঘরে এসে মায়ের কাছে আপেল-কুচো চায়, কিন্তু মা বলেন যে আপেল-কুচো এখন খাওয়া ঠিক হবে না। এই সময়ে কে যেন মা-কে বাইরে ডাকে আর যখন ফের রান্নাঘরে ফিরে আসেন মা তখন দেখেন ভ্লাদিমির নেই। রান্নাঘরের জানলা দিয়ে মাথা গলিয়ে তিনি তখন দেখলেন যে বাইরে বাগানে একটা টেবিলের

ওপর আপেল-কুচোর স্তূপ জমা করে টেবিলের সামনে বসে আছে ভ্লাদিমির। শুধু বসে নেই, প্রাণপণে গোগ্রাসে সে আপেল-কুচো খেয়ে চলেছে। মা এতে বকাবকি করায় ভ্লাদিমির কেঁদে ফেলে বলে যে আর কখনও এমন কাজ করবে না।

গল্পটা বলে মা বলেছিলেন: 'আমাকে না-বলে আর কোনোদিন সে কোনো জিনিসে হাত দেয় নি।'

আরেকবার ভ্লাদিমিরের যখন আট বছর বয়স তখন বাবা তাকে আর তার বড় ভাইবোনকে সঙ্গে করে কাজানে যান। ভ্লাদিমিরের সেই প্রথম যাওয়া। তারপর সেখান থেকে আমাদের এক পিসির সঙ্গে দেখা করতে আমরা যাই কোকুশ্‌কিনো গাঁয়ে। পিসির সেই গাঁয়ের বাড়িতে নিজের আর পিসতুতো ভাইবোনদের সঙ্গে খেলতে গিয়ে ভ্লাদিমির দৈবক্রমে ছোট্ট একটা টেবিলে ধাক্কা খায়। সেই টেবিলের ওপর ছিল জল রাখার একটা কাচের কুঁজো। টেবিল ধাক্কা লাগায় সেই কাচের কুঁজোটা মাটিতে পড়ে চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যায়। আওয়াজ শুনে পিসি ঘরে ঢুকে শুধোলেন:

'কুঁজোটা ভাঙলে কে?'

সঙ্গে সঙ্গে ছেলেমেয়েরা সবাই ও সেইসঙ্গে ভ্লাদিমিরও সমস্বরে চেঁচিয়ে বলল: 'আমি না, আমি না।'

অল্প-পরিচিত এক পিসির সামনে, বিশেষ করে অজানা এক বাড়িতে, নিজের দোষ স্বীকার করতে সেদিন ভয় পেয়েছিল ভ্লাদিমির। তাছাড়া সে ছিল আমাদের সবার ছোট, কাজেই বাকি সবাই 'আমি না, আমি না' বলায় তার পক্ষে 'আমি ভেঙেছি' বলাটা রীতিমতো কঠিন ঠেকেছিল। যাই হোক, কেউ দোষস্বীকার না করায় পিসি আর কারোকে কিছু বললেন না। এর দু'তিন মাস পরে সিম্‌বির্স্কে ফিরে আসার পর একদিন সন্ধেবেলা আমরা ভাইবোনেরা যখন যে-যার বিছানায় শুয়ে পড়েছি আর মা প্রত্যেকের খাটের কাছে গিয়ে আমরা ঠিকমতো শুলাম কিনা তার তদারক করছেন তখন মা-কে কাছে আসতে দেখে ভ্লাদিমির হঠাৎ ফুঁপিয়ে কাঁদতে শুরু করল।

ফোঁপাতে-ফোঁপাতে বলল: 'আন্নাপিসিকে আমি সত্যি কথা বলি নি। ওঁকে বলেছি কাচের কুঁজো আমি ভাঙি নি, আসলে কিন্তু আমিই ভেঙেছি।'

মা সেদিন অনেক বুঝিয়ে ভ্লাদিমিরকে শান্ত করেছিলেন। ওকে আশ্বাস দিয়েছিলেন, আন্নাপিসিকে তিনি ব্যাপারটা লিখে জানাবেন আর আন্নাপিসি নিশ্চয়ই ওকে ক্ষমা করবেন।

এই ব্যাপারটাই প্রমাণ করে মিথ্যাচারকে কতটা ঘৃণা করত ভ্লাদিমির। যদিও অন্যের বাড়িতে সে সত্যি কথাটা বলতে পারে নি, তবু আসল ব্যাপারটা বলতে না-পারা পর্যন্ত শান্তিও পায় নি সে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

সাড়ে ন'বছর বয়সে ভ্লাদিমির স্কুলে ভর্তি হয়। প্রবেশিকা পরীক্ষার জন্যে ওকে তৈরি করতে তার আগের দুটো শীত কাটে। প্রথমে ওকে পড়ান একজন স্কুলশিক্ষক, পরে আমাদের বাড়ির সবচেয়ে কাছে শহরের যে-সরকারি স্কুল ছিল সেখানকার এক শিক্ষিকা। এই শিক্ষিকাটির অত্যন্ত নিপুণা বলে খ্যাতি ছিল। ভ্লাদিমির প্রতিদিন একঘণ্টা করে তাঁর কাছে পড়তে যেত, কখনও-কখনও ঘণ্টা-দুইও পড়ত। শিক্ষিকাটি পড়াতেন স্কুলের ক্লাস শুরু হওয়ার আগে সকাল আটটা থেকে ন'টা পর্যন্ত, আর নয়তো স্কুল শুরু হওয়ার গোড়ায় বাইবেল, সেলাই অথবা ড্রইংয়ের ক্লাস থাকলে তাঁর সেই অবসরের ঘণ্টায়, অর্থাৎ ন'টা থেকে দশটায়। ছেলেবেলা থেকেই ভারি চটপটে ছেলে ছিল ভ্লাদিমির, পড়তে যাওয়ার সময় সে যেন একেবারে উড়ে চলে যেত। আমার এখনও মনে পড়ে হেমন্তের এক ঠাণ্ডা সকালে ওভারকোট পরে যাওয়ার জন্যে মা তাকে পিছু ডাকছেন, কিন্তু তিনি ফিরে তাকাবার আগেই ভ্লাদিমির ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়েছে। সঙ্গে সঙ্গে জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে তাকে ডাকতে গেছেন, কিন্তু দেখেন ততক্ষণে বাড়ির কোণের মোড় ঘুরে সে অদৃশ্য হয়ে গেছে।

ভ্লাদিমির ছিল অতি তীক্ষ্ণধী আর আগ্রহী ছাত্র, তাছাড়া বাবা যেমন বড় ভাইবোনকে তেমনই তাকেও শিখিয়েছিলেন যে-কোনো কাজে অধ্যবসায়ী, নিখুঁতভাবে যথাযথ ও মনোযোগী হতে। তার শিক্ষক-শিক্ষিকারা বলতেন যে ক্লাসের পড়ানো সে এত মনোযোগ দিয়ে শুনত যে তাতেই তার পড়ার কাজ অনেকখানি সমাধা হয়ে যেত। তাছাড়া ভ্লাদিমিরের স্বাভাবিক প্রবণতাও স্কুলের পড়া বুঝতে অনেকখানি সাহায্য করত তাকে, ফলে বাড়িতে আসার পর সেদিনকার পাঠ্যবিষয়ের ওপর দ্রুত একবার চোখ বোলালেই কাজ হয়ে যেত তার। তাই সন্ধেবেলাগুলোয় প্রায়ই দেখা যেত যে আমরা বড় ভাইবোনেরা যখন খাবার ঘরে বড় গোল টেবিলটার চারপাশে বসে বাতির আলোয় আমাদের হোমওয়র্ক করছি ততক্ষণে ভ্লাদিমির তার পড়া শেষ করে আমাদের ঘরে এসে গল্প কিংবা খেলা জুড়েছে,

আর নয়তো ছোট ভাইবোনেদের খোঁচাচ্ছে কিংবা আমাদের জ্বালাতন করছে।

ইশ্‌কুলে তখন উঁচু ক্লাসের ছেলেমেয়েদের প্রচুর পরিমাণে হোমওয়র্ক করতে দেয়া হোত, তাই ভ্লাদিমিরকে আমাদের কাজে বিঘ্ন ঘটাতে দেখলে আমাদের কেউ-না-কেউ ওকে বলতাম: 'এই ভ্লাদিমির, চুপ করবি কি?' কিংবা বলতাম: 'মা, দ্যাখো-না, ভ্লাদিমির আমাদের হোমওয়র্ক করতে দিচ্ছে না!' কিন্তু ভ্লাদিমির বেশিক্ষণ চুপ করে থাকবার পাত্র ছিল না। এজন্যে মা কখনও-কখনও ছোট ভাইবোনেদের নিয়ে বৈঠকখানায় চলে যেতেন আর সেখানে উনি পিয়ানো বাজাতেন আর ভাইবোনেরা গান গাইত।

গান গাইতে ভালোবাসত ভ্লাদিমিরও। সুরের কান আর সঙ্গীতে দক্ষতাও ছিল তার। তবু গান গাওয়ার সময়ও কারো-না-কারো পেছনে লাগার সুযোগ ছাড়ত না সে। আমাদের সবচেয়ে ছোট ভাই মিণ্টি মিতিয়া ছিল ভারি কোমলহৃদয়, এমনকি যখন তার তিন-চার বছর বয়স তখনও সে 'ছোট্ট ছাগলছানার কাহিনী' গানটা গাইতে গিয়ে কে'দে ফেলত। আমরা তাকে বোঝাবার চেষ্টা করতাম যে কাহিনীটা সত্যি নয়, ওটা নিছক গান, কিন্তু যেই সে খানিকটা সাহসে বুক বে'ধে গানটার সবচেয়ে দুঃখের জায়গাগুলো চোখে জল না-এনে আর চোখ-পিটপিট না-করে গাইবার চেষ্টা করত, অমনি ভ্লাদিমির নিঃশব্দে ওর দিকে তাকিয়ে সাংঘাতিক মুখ ভ্যাঙ্‌চাত আর বেশিরকম জোর দিয়ে-দিয়ে এই লাইনটা গাইত: 'ছোট্ট মিণ্টি ছাগলছানায় ফেলল খেয়ে রাক্ষুসে নেকড়েরা...'

এতে মিতিয়া যদি-বা অনেক কষ্টে চোখের জল সামলাত, তবু দুষ্টু ভ্লাদিমির তাকে এত অল্পে ছাড়ত না। মুখখানাকে আরও ভয়ংকর বিকৃত করে সে তখন গাইত: 'ঠাক্‌মা-বুড়ি পেল কেবল ছোট্ট-ছোট্ট খুরের শিংয়ের জোট।' যতক্ষণ-না বাচ্চা মিতিয়া আর সহ্য করতে না-পেরে ভ্যাঁ করে কে'দে ফেলত ততক্ষণ ভ্লাদিমির তাকে জ্বালাত এইভাবে। মনে পড়ে, বাচ্চা মিতিয়াকে এভাবে জ্বালাতন করায় আমি একবার ভীষণ রেগে উঠেছিলাম ভ্লাদিমিরের ওপর।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

বাবা যখন বাড়ি থাকতেন তখন তিনিই আমাদের ভ্লাদিমিরের দৌরাত্ম্য থেকে রক্ষা করতেন ভ্লাদিমিরকে তাঁর পড়ার ঘরে ডেকে নিয়ে গিয়ে হোমওয়র্ক দেখতে চেয়ে। কিন্তু দেখা যেত ভ্লাদিমিরের লেখা উত্তরগুলো প্রায়শই সঠিক হয়েছে।

এরপর বাবা ওর এক্সারসাইজ-খাতা থেকে নিজের খুশিমতো লাতিন শব্দ বেছে নিয়ে ভ্লাদিমিরকে সেগুলোর মানে জিজ্ঞেস করতেন। এক্ষেত্রেও দেখা যেত চটপট উত্তর দিচ্ছে ভ্লাদিমির। এরপরও ভ্লাদিমিরকে অন্যকিছু দিয়ে ব্যস্ত করে রাখার মতো, যেমন ধরা যাক দাবাখেলায় বসিয়ে ভুলিয়ে রাখার মতো, সময় যদি বাবার না-থাকত, তাহলে কিন্তু খাবার ঘরের শান্তি বিশেষ দীর্ঘস্থায়ী হোত না।

দাবাখেলার দারুণ ভক্ত ছিলেন বাবা আর তাঁর এই নেশা আমাদের ভাইয়েদের মধ্যে বর্তেছিল। ভাইয়েদের যে-কারও পক্ষেই এটা একটা রোমাঞ্চকর ব্যাপার ছিল যদি তার ডাক পড়ত বাবার পড়ার ঘরে আর সে গিয়ে দেখত বাবা দাবার ছকে ঘুটি সাজাচ্ছেন। দাবার রাজা, মন্ত্রী, ইত্যাদির মূর্তিসুদ্ধ এই ঘুটিগুলোর জন্যে দারুণ গর্ব ছিল বাবার। আমরা সিম্‌বির্স্কে আসার আগে নিজ্‌নি-নভ্‌গরদে থাকতে বাবা ওই ঘুটিগুলো নিজের হাতে বানিয়েছিলেন। ওগুলো নিয়ে মহা গর্ব ছিল আমাদের, তাঁর ছেলেমেয়েদেরও। আমরা সকলেই দাবাখেলাটা শিখেছিলাম। পরের জীবনে, ভ্লাদিমির যখন বিদেশবাসী হয়ে আছে, তখন মা তাকে ওই দাবার ঘুটির প্রস্তুটা পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হতে ভ্লাদিমির যখন ক্রাকোভে গ্রেপ্তার হয় ও ছাড়া পাওয়ার পর শহর ছেড়ে চলে যেতে হয় তাকে, তখন তার অন্যান্য জিনিসপত্র সহ ওই দাবার ঘুটিগুলোও যায় হারিয়ে। এ-দুঃখ আমাদের ঘোচবার নয়।

ভ্লাদিমির প্রায়ই বাবা কিংবা আলেক্সান্দরের সঙ্গে দাবা খেলতে বসত। আমরা, বোনেরাও দাবা খেলতাম, তবে কম। এখনও মনে পড়ে বাবা আর আমরা বড় তিন ভাইবোন একবার গোটা একটা হেমন্তঋতু ধরে প্রতিদিন দাবা খেলে গেছি। খেলা চলত প্রতিদিন গভীর রাত পর্যন্ত। কিন্তু যখন নিয়মিত পড়াশুনো শুরু হয়ে গেল তখন স্বভাবতই খেলা বন্ধ করতে হল, কেননা খেলার দানগুলো প্রায়ই দীর্ঘস্থায়ী হোত, অনেক সময় চলে যেত তাতে।

যা-কিছুই করত ভ্লাদিমির তাই-ই খুব গুরুত্ব দিয়ে করত। দাবাখেলার ব্যাপারেও আলেক্সান্দরের মতো সে রীতিমতো বই পড়ে খেলাটার খুঁটিনাটি শিখেছিল এবং পরে পুরোদস্তুর পাকা খেলোয়াড় হয়ে উঠেছিল। পরের জীবনে সে যখন বাধ্য হচ্ছিল গ্রামে কিংবা জেলাশহরে থাকতে, নির্বাসনে যেতে কিংবা বিদেশবাসী হতে, তখন তার দুর্বহ জীবনকে প্রায়ই হালকা করে তুলতে সাহায্য করেছে এই দাবাখেলা। সে যখন স্কুলের ছাত্র তখনই সর্বদাই ভারি ব্যস্ত হোত

আলেক্সান্দরের সঙ্গে একদান দাবা খেলার জন্যে। তবু এটা-যে তার অবসর-সময় কাটানোর সবচেয়ে প্রিয় উপায় ছিল তা বলা যায় না। আসলে আলেক্সান্দর যা করত তা-ই করতে চাইত সে। বড়ভাইয়ের ভীষণ অনুরক্ত ছিল ভ্লাদিমির, একেবারে খুঁটিনাটি ব্যাপারেও সে দাদার আদর্শ অনুসরণ করে চলত। ভ্লাদিমিরকে যে-কথাই জিজ্ঞেস করা হোত-না কেন — যেমন, কোন খেলা সে খেলতে চায়, বেড়াতে যেতে চায় কিনা, পরিজের সঙ্গে দুধ না মাখন কী মিশিয়ে খেতে চায়, যা-ই হোক-না কেন — উত্তর দেবার আগে বিনা ব্যতিক্রমে প্রতিবারই সে আলেক্সান্দরের দিকে তাকাত। আলেক্সান্দর এতে মজা পেয়ে ইচ্ছে করে উত্তর দিতে দেরি করত আর চোখ-পিটপিট করে তাকিয়ে থাকত ভাইয়ের দিকে। আমরা সবাই এ-নিয়ে ভ্লাদিমিরকে কত খেপাতাম, কিন্তু তাতে কিছু ফল হোত না, ভ্লাদিমির আরও জিদ ধরে বলত: 'আলেক্সান্দর যা করে আমিও তা-ই করব।' আর যেহেতু আলেক্সান্দর ছিল কঠোর কর্তব্যবোধসম্পন্ন দায়িত্বশীল ও চিন্তাশীল ছেলে, সেইহেতু ভ্লাদিমিরের পক্ষে সে ছিল অনুকরণযোগ্য ভারি চমৎকার এক আদর্শ। ছোট ভাইটির সামনে সর্বদা জাগরূক ছিল যে-কোনো কাজেই দাদার গভীর মনঃসংযোগ, নিখুঁত নৈপুণ্য ও ঐকান্তিকতার আদর্শ, আর তার অসামান্য কর্মশক্তি।

দাদাকে মনপ্রাণ ঢেলে ভালোবাসত বলে আলেক্সান্দরের আদর্শ ভ্লাদিমিরকে বেশ প্রভাবিত করেছিল। আমাদের সকলের সামনেই আলেক্সান্দর-যে শুধু কাজ করা সম্বন্ধে তার দায়িত্বপূর্ণ মনোভঙ্গির আদর্শ তুলে ধরেছিল তা-ই নয়, তুলে ধরেছিল মানুষ সম্পর্কে তার দৃষ্টিভঙ্গির আদর্শও; অন্যের মন বুঝে চলার ব্যাপারে তার ক্ষমতা ও স্নেহমমতা, তার ন্যায়পরায়ণতা ও দৃঢ়তার কারণে আমরা প্রাণের চেয়েও ভালোবাসতাম আলেক্সান্দরকে। ভ্লাদিমির এমনিতে ছিল রগচটা ছেলে, কিন্তু আলেক্সান্দরের ধীরস্থির প্রকৃতি ও আত্মসংযমের প্রচণ্ড ক্ষমতা আমাদের সবাইকে, বিশেষ করে ভ্লাদিমিরকে, প্রভাবিত করেছিল। একদা দাদাকে অনুকরণ করার মধ্যে দিয়ে যার শুরু তা পরে নিজের ওই চরিত্রগত ত্রুটি সংশোধনের সচেতন প্রয়াস হিসেবে বিকশিত হয়ে ওঠে, আর পরবর্তী জীবনে আমরা কখনও, কিংবা প্রায় কখনও, ভ্লাদিমিরের বদমেজাজের সম্মুখীন হই নি।

কাজ করার ক্ষমতা বাড়িয়ে তোলার ব্যাপারেও ওই একই প্রয়াস চালায় ভ্লাদিমির। আগেই বলেছি, ভ্লাদিমির তার স্কুলের পড়াশুনোয় ছিল অত্যন্ত মনোযোগী, চমৎকার ছাত্র ছিল সে। তবে তার যোগ্যতা অসামান্য মাপের ছিল বলে

এর জন্যে তাকে প্রায় কোনো কষ্টই করতে হয় নি — প্রয়োগ করতে হয় নি নিজের পূর্ণক্ষমতা।

নিজের এবং চারপাশের আর সকলের বিষয়মুখ ও কড়া বিচারক ছিল বলে নিজের দোষত্রুটি খুব তাড়াতাড়ি ধরতে পারত ভ্লাদিমির। একদিন ওলিয়াকে ধৈর্য ধরে অনেকক্ষণ পিয়ানোয় গলা সাধতে শোনার পর সে আমায় বলেছিল: 'ওর অধ্যবসায় ঈর্ষা করার মতো।' ওইদিন থেকে সে নিজেও এই গুণটি আয়ত্ত করার চেষ্টা শুরু করে। বিশ্ববিদ্যালয় থেকে যখন ভ্লাদিমির স্নাতক-ডিগ্রি নিয়ে বেরিয়েছে তার মধ্যেই এই অধ্যবসায়-গুণটি তার চরিত্রের এক বিশিষ্ট লক্ষণ হিসেবে দেখা দিয়েছে, আর পরিণত বয়সে এটি তো তার মধ্যে বিকশিত হয়ে উঠেছে বিপুল মাত্রায়।

যখন ভ্লাদিমির নিতান্তই বালক তখনই তার মধ্যে চারিদিকের ব্যাপারস্যাপার সমালোচকের দৃষ্টিতে দেখতে পারার ক্ষমতা আমি লক্ষ্য করি। প্রাণচঞ্চল যে দুষ্টু ছেলেটির অন্যদের স্বভাবের হাস্যকর দুর্বলতাগুলি অত সহজে নজরে পড়ে যেত আর যা নিয়ে সে হাসি-মশ্‌করা জুড়ত ও অন্যদের খেপাত, তার কিন্তু মানুষের চরিত্রের অন্যান্য দিকও মোটেই নজর এড়াত না। ওলিয়ার ধৈর্য নিয়ে গলা সাধার মতো ঘটনায় মানুষের স্বভাবের গুণগুলিও তার ঠিকই চোখে পড়ত এবং সে সর্বদাই মিলিয়ে দেখত তার নিজের মধ্যে অমন গুণ আছে কিনা, অন্য মানুষের ক্রিয়াকলাপে এমন কিছু আছে কিনা যা আত্মস্থ করে নেয়া যায়।

আমি মনে করি, এটিই হল ভ্লাদিমিরের চরিত্রের সবচেয়ে লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্যগুলির একটি। মনে পড়ে বহুবার, বহু ব্যাপার-প্রসঙ্গে তাকে বলতে শুনেছি: 'ভাবছি, অমন একটা কাজ করার মতো সাহস কি আমার হোত? মনে তো হয় না।'

ছেলেবেলায় সে কখনোই হামবড়া-ভাব দেখায় নি বা মাতব্বরি চালে চলে নি কখনও। পরের জীবনেও এই ধরনের অপ্রীতিকর চারিত্র্যলক্ষণ তার দুচক্ষের বিষ ছিল। ১৯২০ সালে কম্‌সমোল সংগঠনের তৃতীয় কংগ্রেসে এক বক্তৃতায় সে দেশের যুব-সমাজকেও সতর্ক থাকতে বলে এইসব চরিত্রগত দোষত্রুটির বিরুদ্ধে।

সত্যি কথা বলতে কী, বাবা নিজেও এই হামবড়া-ভাবের ঘোর বিরোধী ছিলেন এবং যদিও আমরা, তাঁর ছেলেমেয়েরা সকলেই, বিশেষ করে ভ্লাদিমির তো বটেই, ইশ্‌কুলে সবসময়ে ভালো ফলাফল দেখিয়ে এসেছি, তবু তিনি কখনোই আমাদের প্রশংসায় মুখর হন নি, আমাদের সাফল্যে মনে-মনে আনন্দ পেলেও সর্বদা আমাদের উৎসাহিত করেছেন আরও ভালো ফল দেখানোর জন্যে।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

স্কুল থেকে বাড়ি ফেরার পর প্রতিদিন ভ্লাদিমির বাবাকে বলত সেদিন বিভিন্ন ক্লাসে কোন-কোন বিষয়ে কী পড়ানো হয়েছে আর সে নানা প্রশ্নের কী উত্তর দিয়েছে। তার এই উত্তরগুলো সাধারণত সঠিক হোত ও ভ্লাদিমির ভালো নম্বর পেত বলে পরে সে কখনও-কখনও সংক্ষেপে দ্রুত জানিয়ে দিত বাবাকে: 'গ্রীক ভাষায় — চমৎকার, জার্মান ভাষায় — চমৎকার।' দোতলায় তার নিজের ঘরে যাওয়ার পথে বাবার পড়ার ঘরের সামনে দিয়ে যেতে-যেতে এইসব খবর দিত সে।

এখনও এ-ব্যাপারে আমার চোখে স্পষ্ট একটা ছবি ভেসে ওঠে। তা হচ্ছে এই: বাবা তাঁর পড়ার ঘরে বসে আছেন আর আমি দেখছি মায়ের সঙ্গে তিনি খুশির হাসি বিনিময় করছেন আর দেখছেন তাঁর দরজার সামনে দিয়ে স্কুলের ইউনিফর্ম-পরা ভ্লাদিমিরের গাঁট্টাগোট্টা চেহারাটা দৌড়ে চলে যাচ্ছে, তার স্কুল-ক্যাপের ফাঁক দিয়ে ঝুলে পড়েছে একগোছা লালচে-বাদামি চুল, আর সে রিন্‌রিনে গলায় চেঁচিয়ে বলতে-বলতে চলেছে: 'লাতিন ভাষায় — চমৎকার, বীজগণিতে — চমৎকার।' তার এই পাঠ্য বিষয়গুলোর রকমফের ঘটত প্রায়ই, কিন্তু তার পাওয়া নম্বরের হেরফের ঘটত কালেভদ্রে।

ওই সময়ে বাবা প্রায়ই মা-কে বলতেন মনে পড়ে যে ভ্লাদিমির এত সহজে সব বিষয় আয়ত্ত করে ফেলছে যে তাঁর ভয় হচ্ছে ছেলের খাটবার ক্ষমতার বিকাশ ঘটবে কিনা। অবশ্য এখন আমরা বুঝতে পারছি তাঁর ওই আশঙ্কার কোনো কারণ ছিল না। কাজ করার প্রায় অমানুষিক ক্ষমতা অর্জন করে ফেলেছিল তাঁর ভ্লাদিমির।

কিন্তু তাই বলে খেলাধুলোয়, হৈ-হল্লাতেও অরুচি ছিল না তার। যখন আমাদের বাড়িতে তার বন্ধুরা আসত কিংবা যখন ছোট দুটি ভাইবোন — ওলিয়া আর মিতিয়ার সঙ্গে জুটত সে, তখন সবরকম খেলায় মোড়লি করত সে-ই। তার প্রাণখোলা দরাজ হাসিতে, অফুরান ঠাট্টা-রসিকতা আর গল্পে গমগম করতে থাকত সারা বাড়ি।

সিম্‌বির্স্ক শহরের সরকারি স্কুলের শিক্ষিকা ও আমাদের পরিবারের এক ঘনিষ্ঠ বন্ধু ভেরা কাশ্‌কাদামভা তাঁর স্মৃতিকথায় বর্ণনা দিয়েছেন আমাদের গোটা পরিবার যখন চা-সহযোগে রাত্রের খাবারের টেবিলে জড় হোত তখন সাধারণত কেমন হাসিখুশির হুল্লোড় পড়ে যেত তার। তিনি বলছেন: 'ভ্লাদিমির আর তার মেজোবোন ওলিয়াই ছিল সবচেয়ে হুল্লোড়বাজ। ওদের দু'জনের উচ্ছল খুশির কাকলি আর সংক্রামক হাসির বন্যা ছিল অপ্রতিরোধ্য।' ওরা আমাদের শোনাত

ইশ্‌কুলে সেদিন যা-যা ঘটেছে তার বিবরণ আর ওদের হরেক নষ্টামি আর নিয়মভাঙার ইতিবৃত্ত। বাবাও তখন আমাদের গল্পগুজবে যোগ দিতে ভালোবাসতেন; পড়ার ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এসে আমাদের দলে যোগ দিয়ে তিনি শোনাতেন স্কুলের জীবনের নানা হাসিঠাট্টা আর মজার কাহিনী, তাঁর নিজের স্কুল-জীবনের কথা আর তাঁর বন্ধুদের নানা ব্যাপার। কাশ্‌কাদামভা লিখছেন: 'সবাই তখন হাসত, খুশিতে উচ্ছল হয়ে উঠত সবাই। এমন এক প্রাণখোলা, বন্ধুত্বে-ভরা পরিবারে সবার আপন বনে যাওয়া ছাড়া উপায় ছিল না।'

এখনও আমার মনে রয়ে গেছে ভ্লাদিমিরের সে-সময়কার কিছু-কিছু দুষ্টুমির কথা। আমাদের এক মাসতুতো বোন ডাক্তার একবার আমাদের বাড়িতে বেড়াতে আসেন। সেকালে ডাক্তাররা প্রায় সকলেই ছিলেন পুরুষ, আমাদের মাসতুতো বোনটি ছিলেন প্রথম অল্প কয়েকজন মেয়ের একজন যাঁরা ডাক্তারি পেশা নিয়েছিলেন। আত্মীয়াটি যখন বৈঠকখানায় বসে বাবা-মায়ের সঙ্গে গল্প করছেন তখন দরজার আড়ালে চাপা হাসি আর ফিসফিস কথা শোনা গেল। আর এরপরই হঠাৎ দেখা গেল ভ্লাদিমির ছুটে ঘরে ঢুকে বেশ স্বচ্ছন্দভাবে আমাদের অতিথিকে বলছে:

'আনিউতা, আমার অসুখ করেছে। একটু-কিছু ওষুধ দিন দেখি।'

ও-যে রসিকতা করছে এটা বুঝতে পেরে তরুণী ডাক্তারটি ভারি সদয় ভাব দেখিয়ে শুধোলেন: 'তাই নাকি? তা, কী হল তোমার?'

'আমার পেট ভরছে না কিছুতে। যতই খাচ্ছি তবু পেটে খিদে থেকে যাচ্ছে।'

'তাই বুঝি? ঠিক আছে, এক কাজ কর। রান্নাঘরে গিয়ে বড় এক-টুকরো কালো রুটি কেটে নিয়ে তাতে নুন ছড়িয়ে খাও দেখি।'

'তা-ও করে দেখেছি। কিন্তু ওতে কিছু উপকার হচ্ছে না।'

'তবু ফের একবার চেষ্টা করে দ্যাখো দেখি। এবার নিশ্চয়ই উপকার হবে।'

এবার ভ্লাদিমিরকে হার মেনে পালিয়ে যেতে হল।

সঙ্গীতও ভারি পছন্দ ছিল ভ্লাদিমিরের। মা ওকে পিয়ানোয় সর্‌গম আর সহজ কিছু-কিছু বাজনা বাজাতে শিখিয়েছিলেন, বাচ্চাদের সহজ কিছু গানের স্বরলিপি ও অন্যান্য টুকরো-টাকরা বাজনাও অভ্যেস করার জন্যে দিয়েছিলেন। ফলে অল্পদিনের মধ্যেই দিব্যি ভালো বাজাতে শিখে গেল ভ্লাদিমির। ওর মধ্যে সঙ্গীতজ্ঞ হওয়ার দারুণ সম্ভাবনা দেখা গিয়েছিল, তাই পরে ও সঙ্গীত-চর্চা ছেড়ে দেয়ায় মা খুব দুঃখিত হয়েছিলেন।

সেকালের দিনে বসন্ত এলে খাঁচায়-রাখা পাখিদের মুক্তি দেয়ার রেওয়াজ ছিল।
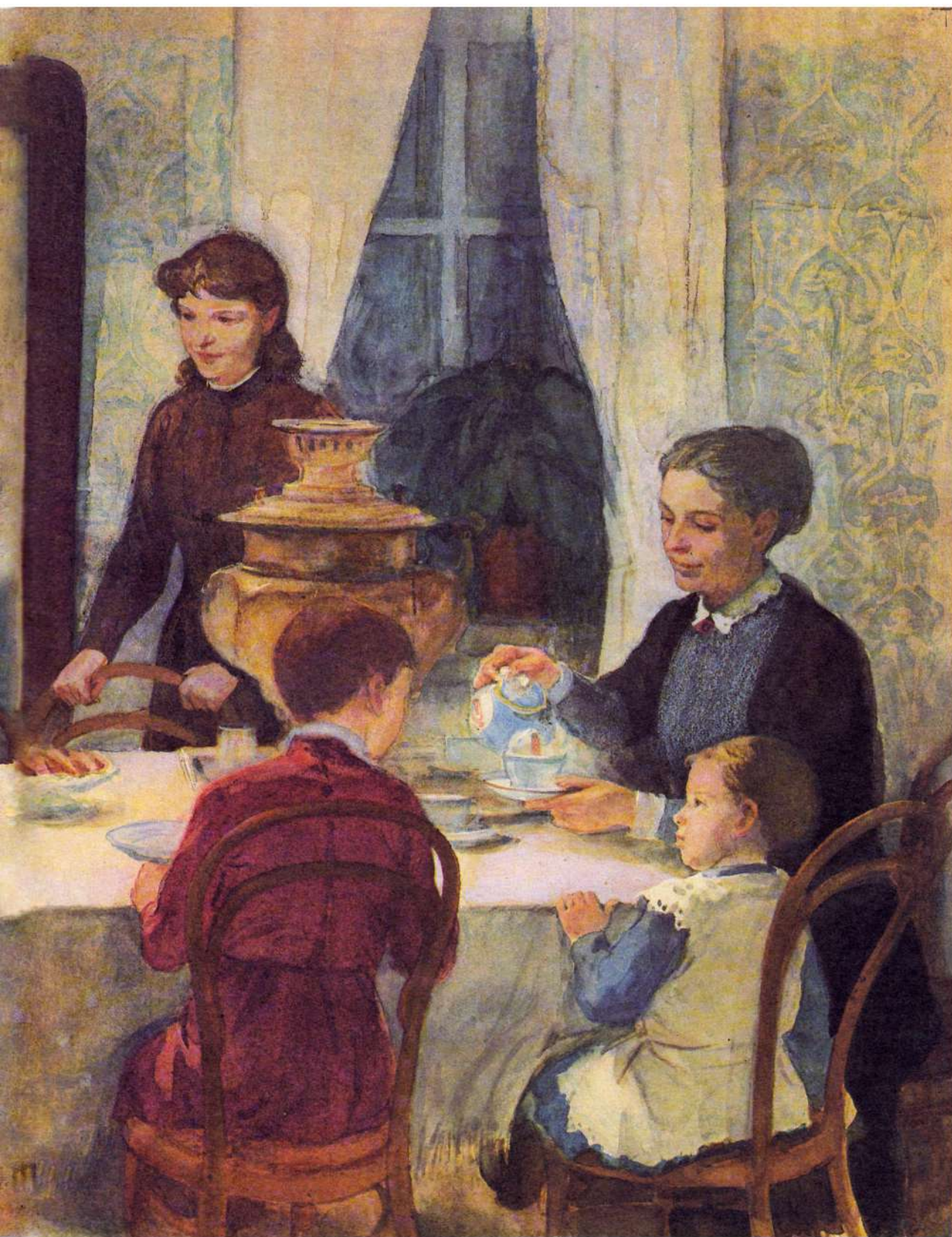
এই প্রথা ভারি মনমতো ছিল ভ্লাদিমিরের। প্রতিবছর বসন্তকালে মায়ের কাছে ও পয়সা চাইত খাঁচার পাখি কিনে এনে তাকে ছেড়ে দেবে বলে।

খুব ছেলেবেলায় ভ্লাদিমির নিজে-নিজে পাখি ধরতে ভালোবাসত। বন্ধুদের সঙ্গে মিলে সে পাখি ধরার ফাঁদ পাতত। একবার সে খাঁচায় করে একটা লিনিট বা শ্যামাজাতীয় গায়ক-পাখি বাড়িতে এনেছিল। পাখিটা সে ফাঁদ পেতে ধরেছিল, নাকি কিনেছিল, কিংবা কেউ তাকে পাখিটা উপহার দিয়েছিল কিনা আজ আমার তা মনে নেই। কেবল এইটুকু মনে আছে লিনিট-পাখিটা বেশিদিন বাঁচে নি। দুঃখে পাখিটা ক্রমশ শুকিয়ে যাচ্ছিল আর পালক ঝরে যাচ্ছিল তার, তারপর একদিন মরে গেল সেটা। কেন-যে এমনটা হল তা জানি না — ভ্লাদিমির হয়তো পাখিটাকে ঠিকমতো দানাপানি দেয় নি তা-ও হতে পারে।

মনে পড়ে, কেউ তাকে এ-নিয়ে সেদিন বকাবকি করেছিল। বকুনি খেয়ে গম্ভীর মুখে, অন্যমনস্কভাবে ভ্লাদিমির কিছুক্ষণ তাকিয়ে ছিল মরা পাখিটার দিকে, তারপর গলায় দৃঢ়-সংকল্প ফুটিয়ে বলে উঠেছিল: 'আর কোনোদিন খাঁচায় পাখি পুষব না আমি।'

আর সত্যিই সে আর কোনোদিন পাখি পোষে নি।

সিম্‌বির্স্ক শহরের নদী স্ভিয়াগায় মাছ ধরতেও ভালোবাসত ভ্লাদিমির। একবার তার এক বন্ধু এসে বলে, কে যেন তাকে বলেছে যে কাছের একটা প্রকাণ্ড জলভরা খানায় নাকি খুব হলদে পোনামাছ পাওয়া যাচ্ছে, কাজেই সেখানে মাছ ধরতে যাই চল্‌। খানাটার ধারে পৌঁছে ভ্লাদিমির যেই ঝুঁকে পড়ে দেখতে গেছে অমনি জলে পড়ে গিয়ে খানার নিচের পাঁকে তলিয়ে যেতে থাকে। বন্ধুটি পরে বলেছিল: 'জানি না সেদিন শেষপর্যন্ত কী হোত যদি-না খানার পাড়ের এক কারখানার মজুর আমাদের চ্যাঁচামেচি শুনে ছুটে এসে ভ্লাদিমিরকে খানা থেকে টেনে তুলত। এই ঘটনার পর আমাদের আর কোনোদিন স্ভিয়াগায় মাছ ধরতে যেতে দেয়া হয় নি।'

যদিও ছেলেবেলায় মাছধরা আর পাখিধরায় উৎসাহ ছিল ভ্লাদিমিরের, তবু এসব নেশা তাকে কোনোদিন পেয়ে বসে নি এবং স্কুলের উঁচু ক্লাসে ওঠার পর এসব শখ তার ছুটে গিয়েছিল একেবারে। তাই দেখা যায় সেই সময়ে আলেক্সান্দর যখন গ্রীষ্মের ছুটিতে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাড়ি আসত তখন সাধারণত মিতিয়াই তার পোকামাকড় আর জলের অন্যান্য প্রাণী ও উদ্ভিদ সংগ্রহের অভিযানে স্ভিয়াগা নদীতে নৌকোযাত্রায় সঙ্গী হোত। স্কুলে থাকতেই আলেক্সান্দর প্রকৃতি-বিজ্ঞান নিয়ে পড়াশুনোয় আগ্রহী হয়ে উঠেছিল। বিশ্ববিদ্যালয়েও সে ভর্তি হয় প্রকৃতি-

বিজ্ঞান ফ্যাকাল্টিতে আর তার থিসিস লেখার মালমশলা সংগ্রহ করার জন্যে প্রতি গ্রীষ্মে সে এইভাবে গবেষণার কাজ চালাত।

ভ্লাদিমিরের কিন্তু প্রকৃতি-বিজ্ঞান ভালো লাগত না। স্কুলে পড়ার সময় তার উৎসাহ ছিল লাতিন ভাষা, ইতিহাস, ভূগোল আর সাহিত্যে আর ভালোবাসত নানা বিষয়ে রচনা লিখতে। রচনা লেখায় ভারি চমৎকার হাত ছিল তার।

যখন ভ্লাদিমির রচনা লিখত তখন শুধুমাত্র পাঠ্য বই আর শিক্ষক-শিক্ষিকা যা বুঝিয়েছেন তার ওপরই নির্ভর করত না, লাইব্রেরি থেকে অন্য বই এনে সেসব বইয়েরও সাহায্য নিত সে। তার লেখা রচনাগুলি হোত সর্বদাই সারবান, বক্তব্য বিষয়গুলি চমৎকারভাবে গুছিয়ে তুলত সে আর লিখতও সুন্দর সাহিত্যিক ভাষায়। স্কুলের প্রধান শিক্ষক উঁচু ক্লাসগুলিতে সাহিত্য পড়াতেন আর ভ্লাদিমির ছিল তাঁর প্রিয় ছাত্র, ভ্লাদিমিরের কাজের তিনি উচ্চ প্রশংসা করতেন, সবচেয়ে বেশি নম্বর দিতেন তাকে।

ছেলেদের সাধারণত যেসব হাতের কাজের শখ থাকে ভ্লাদিমিরের সেসব কিছু ছিল না। ক্রিস্‌মাস-গাছ সাজানোর জন্যে নানারকম পুতুল ও সাজসজ্জা অন্য ভাইবোনের সঙ্গে মিলে সে বানাত বটে আর এই সাজানোর কাজটাও ছিল আমাদের সকলের ভারি প্রিয়। তবু এছাড়া অন্য কোনোরকম হাতের কাজে — ছুতোরমিস্ত্রির কাজ বা অন্যকিছুতে তাকে কোনোদিন ব্যস্ত থাকতে দেখেছি বলে তো মনে পড়ে না। এমনকি অন্য ছেলেদের কাছে যে-হাতের কাজ ভারি প্রিয় এবং আলেক্সান্দরও যে-কাজে ওস্তাদ ছিল সেই পাতলা কাঠের ওপর করাত দিয়ে নকশা খোদাইয়ের কাজটা নিয়েও সময় কাটাতে কখনও দেখা যায় নি ভ্লাদিমিরকে।

স্কুলের পড়াশুনো ছাড়া বাকি সময়টা এবং শীত ও গ্রীষ্মের ছুটিগুলোও তার পুরোপুরি ভরে থাকত নানারকম বাইরের বই পড়া (আর পড়ার সময় সর্বদাই মুখে সূর্যমুখী ফুলের বীজ চিবনো — এটা আবার তার ভারি পছন্দসই ছিল), দৌড়নো, হেঁটে বেড়িয়ে বেড়ানো, শীতকালে স্কেটিং করা, 'ক্রোকে' খেলা আর সাঁতার কাটায়। অ্যাড্‌ভেঞ্চারের গল্প পড়ার ঝোঁক ছিল না তার কোনোদিন, সে বরং পছন্দ করত গোগলের গল্প-উপন্যাস ও পরে তুর্গেনেভের গ্রন্থাবলি। কয়েকবার ফিরে-ফিরে এই সমস্ত বই পড়েছিল সে।

ক্লাসের সহপাঠীদের সঙ্গে ভ্লাদিমিরের বেশ ভাবসাব ছিল। অসুবিধেয় পড়লে তাদের পড়া বলে দিয়ে সাহায্য করত সে, তর্জমার কাজ আর নিবন্ধরচনা সংশোধন করে দিত এবং কখনও-কখনও কোনো সহপাঠী রচনা ঠিকমতো গুছিয়ে লিখতে না-পারলে সে তাদের হয়ে রচনাগুলি লিখে দিত পর্যন্ত। ভ্লাদিমির

আমাকে বলত, অন্য কেউ, বিশেষ করে সে-যে সহপাঠীর হয়ে রচনা লিখে দিয়েছে এটা কারোকে না-বলে তার কোনো সহপাঠী যদি রচনায় ভালো নম্বর পেত তাহলে ভারি খুশি হোত সে। স্কুলে টিফিনের ছুটির সময় সহপাঠী বন্ধুদের পড়া বুঝিয়ে দিয়ে ভ্লাদিমির তাদের সাহায্য করত এবং কখনও-কখনও আলেক্সান্দরের মতো সে-ও স্কুল শুরু হওয়ার আধঘণ্টা আগে এসে কারও-বা গ্রীক কি লাতিন ভাষার কঠিন একটা অনুচ্ছেদ তর্জমা করে দিত কিংবা জ্যামিতির জটিল একটা উপপাদ্য বুঝিয়ে দিত অপর কারোকে। এইভাবে গোটা ক্লাসটাই নির্ভরশীল ছিল ভ্লাদিমিরের ওপর আর নিজে এগিয়ে চলার সঙ্গে সঙ্গে অন্য সহপাঠীদেরও সঙ্গে টেনে নিয়ে চলত সে।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

সিম্‌বির্স্কে প্রথম এসে পৌঁছনোর পর গোড়ার দিকে আমরা কমবেশি অসুবিধেজনক একটা ফ্ল্যাট থেকে আরেকটা একই ধরনের ফ্ল্যাটে বাসাবদল করে চলেছিলাম কিছুদিন। অবশেষে বাবা মস্কভ্‌স্কায়া স্ট্রিটে কাঠের-তৈরি একখানা বাড়ি কেনার পর এই অবস্থার পরিসমাপ্তি ঘটল। এই বাড়িখানি এখন 'লেনিন মিউজিয়মে' পরিণত হয়েছে এবং যতদূর সম্ভব বাড়িটির সবক'খানা ঘর আর আসবাবপত্রের এমনভাবে পুনরুদ্ধারসাধন করা হয়েছে যার ফলে বালক লেনিন ওখানে থাকার সময় বাড়িটি যেমন ছিল ঠিক তেমনই দেখতে লাগে সবকিছু।

বাড়িখানি আসলে ছিল একতলা, ওপরতলার চিলেকোঠাগুলি কেবল ব্যবহার করা হোত আমাদের, ছেলেমেয়েদের শোবার ঘর হিসেবে। ছাদের একপ্রান্তে আলেক্সান্দরের ঘরের পাশেই ছিল ভ্লাদিমিরের ঘর; আর অপর প্রান্তে ছিল আমার আর তিনটি ছোট ভাইবোনের দু'খানা ঘর; আমাদের একতলায় নামার সিঁড়িও ছিল পৃথক। এই বাড়িতে আমরা যখন উঠে আসি তখন ভ্লাদিমিরের বয়স ছিল আট বছর; ফলে ইশ্‌কুলের প্রথম পাঁচটা বছর তার কাটে আলেক্সান্দরের কাছাকাছি, তার পাশের ঘরে থেকে। সঙ্গে সঙ্গে থেকে করণীয় প্রতিটি কাজ সম্পর্কে দাদার দায়িত্বশীল মনোভঙ্গি আত্মস্থ করে নেয় সে, প্রকৃতি-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে দাদার পরীক্ষা-নিরীক্ষা স-মনোযোগ লক্ষ্য করে, যে-সমস্ত বই আলেক্সান্দর পড়েছে সেইসব বই পড়ে এবং দাদার পরামর্শ অনুযায়ী চলে সর্বদাই।

আমাদের বাড়ির পেছনদিকে সুন্দর ঘাসে-ছাওয়া এক-টুকরো জমি সমেত লম্বা একটা উঠোন ছিল আর সেখানে আমাদের জন্যে বানিয়ে দেয়া হয়েছিল চরকি-পাক ঘোরার একটা ব্যায়ামের যন্ত্র। উঠোনটার যেদিকে ছিল পক্রুড্স্কায়া স্ট্রিট সেদিকটায় মোটামুটি বড় একটা বাগান ছিল আমাদের। এই বাগানের বেড়ার গায়ে ছিল ছোট একটা ফটক। শীতকালে স্কেটিং রিঙ্ক-এ এবং গ্রীষ্মকালে স্ভিয়াগা নদীতে স্নানের জন্যে যেতে হলে আমরা এই ফটকটা ব্যবহার করতাম। নদীতে ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্যে নির্দিষ্ট একটা ঘেরা-জায়গা আমরা ভাড়া নিতাম প্রতিদিন সকালে একঘণ্টা আর সন্ধেবেলা একঘণ্টার জন্যে। সেখানে পালা করে সকাল-সন্ধেয় আধঘণ্টা করে সাঁতার কাটতাম আমরা। প্রথমে বাবা আর ভাইয়েরা আধঘণ্টার জন্যে সাঁতার কাটাতেন সেখানে, তারপর মায়ের সঙ্গে আমরা, বোনেরা যেতাম সাঁতার কাটতে বাকি আধঘণ্টা। আমাদের দুটো দল স্নান সেরে এসে মিলিত হোত স্ভিয়াগা থেকে বাড়ির পথের মাঝামাঝি একটা জায়গায়, পক্রুড্স্কায়া স্ট্রিটের পাশে ঘাসে-ছাওয়া নির্জন একটা ঢালু জায়গায়।

আমাদের বাগানটা প্রায় সমস্তটাই ভরা ছিল ফলের গাছে: আপেল আর চেরিফলের গাছ এবং নানা জাতের বেরিঝোপে। এছাড়া ভারি চমৎকার একটা ফুলবাগানও ছিল আমাদের। মা বাগান করতে ভালোবাসতেন বলে তিনিই ছিলেন এসবের আসল কর্ত্রী। আমরা কখনও বাগান করার জন্যে মালি রাখি নি। একমাত্র বসন্তকালে বা হেমন্তে আপেলগাছের গোড়াগুলো খুঁড়ে দেয়া এবং আরও কিছু-কিছু ভারি কাজের জন্যে সাময়িকভাবে ঠিকা লোক রাখা ছাড়া। এছাড়া বাগানের আর যত-কিছু কাজ সব করতেন মা নিজে আর আমরা ভাইবোনের দল তাঁর ফাইফরমাশ খাটতাম।

গ্রীষ্মের সন্ধেগুলোয়, বিশেষ করে একেকটা শুকনো, গরম দিনের শেষে, আমরা সকলেই নানা ধরনের জগ, মগ, গামলা আর যাতে-যাতে জল নেয়া যায় এমন সবকিছু পাত্র যোগাড় করে কুয়ো থেকে বাগানে জল বয়ে নিয়ে যেতাম। আমার মনে পড়ে এ-কাজে ভলোদিয়ার কত চটপটে ছিল, কত তাড়াতাড়ি সে গাছে জল দিয়ে খালি-পাত্র নিয়ে ফের ছুটত জল আনতে।

বাগানে আমাদের ইচ্ছেমতো আশ মিটিয়ে খাওয়ার মতো যথেষ্ট ফলফুলুরি আর বেরি ফলত। কিন্তু এ-ব্যাপারে একটা বিশেষ নিয়ম চালু করেছিলেন মা। আপেলগুলোয় যখন পাক ধরতে শুরু করত তখন শুধু বাতাসে গাছের-নিচে-পড়া আপেলই আমরা কুড়িয়ে খেতে পারতাম, গাছ থেকে আধপাকা বা কাঁচা আপেল পাড়ার হুকুম ছিল না আমাদের। তাছাড়া আমরা শুধু সেইসব জাতের আপেলই

খেতে পেতাম প্রথমে যেসব জাতের আপেল আগে পাকত আর নষ্ট হয়ে যেত তাড়াতাড়ি। অন্যান্য জাতের আপেল রেখে দেয়া হোত শীতকালে খাবার জন্যে কিংবা জ্যাম বানানোর জন্যে। এর ফলে হেমন্তের মাসগুলোতে আর সারা শীতকাল জুড়ে প্রচুর আপেল খেতে পেতাম আমরা।

আজও মনে পড়ে সেদিন কী সাংঘাতিক চটে গিয়েছিলাম আমরা সবাই যেদিন আমাদের বাড়িতে বেড়াতে এসে একটি বাচ্চা মেয়ে খুব-একটা কারদানি দেখাবার চেষ্টা করছিল। মেয়েটা করছিল কী, একদৌড়ে এককেটা আপেলগাছের তলা দিয়ে যেতে-যেতে ছুটন্ত অবস্থাতেই এককেটা আপেল দাঁত দিয়ে বোঁটা থেকে ছিঁড়ে নিচ্ছিল। এ-ধরনের আচরণের অর্থ কী, তা আমাদের বোধগম্য হয় নি। যাই হোক, যা বলছিলাম, বেরিঝোপের বেলাতেও মায়ের ছিল ওই একই নির্দেশ। কোন-কোন স্ট্রবেরি, রাস্প্‌বেরি কিংবা চেরিগাছ আমরা 'মুড়িয়ে খেতে' পারি আর দেরিতে ফল পাকে কিংবা তাদের ফলে জ্যাম বানানো হবে বলে কোন-কোন ঝোপ আর গাছ আমাদের ছোঁওয়া বারণ সে-ব্যাপারে মায়ের স্পষ্ট নির্দেশ ছিল। আমার মনে আছে, গ্রীষ্মকালে বাগানের যে-কুঞ্জবনে বসে আমরা সন্ধেবেলা চা খেতাম তার কাছেই পাকা ফলের-ভারে-ঝুকে-পড়া তিনটে ভারি সুন্দর চেরিগাছ দেখে আমাদের পরিবারের বন্ধুরা কী সাংঘাতিক অবাক হয়ে যেতেন, কেননা গাছ তিনটে থেকে ফল পাড়া খুবই সহজ অথচ আমরা কেউ সেগুলোতে হাত দিচ্ছি না — এটা তাঁদের কাছে ছিল অকল্পনীয়। আসলে আমরা, ভাইবোনেরা কেউ ওই তিনটে গাছে হাত দিতাম না বাবার জন্মদিন, ২০ জুলাইয়ের আগে।

কৈফিয়ত হিসেবে মা অতিথিদের বলতেন: 'বাগানের আর সব গাছ থেকে ফল খেতে বাচ্চাদের কোনো বাধা নেই। আমি ওদের বলেছি কেবল এই তিনটে গাছের ফলে ২০ তারিখের আগে হাত না-দিতে।'

আমাদের ধমকাধমকি না-করে বা অতিমাত্রায় নিষেধের বেড়াজালে না-বেঁধেও এইভাবে মা সব ব্যাপারে শৃঙ্খলা রক্ষা করতেন। আমাদের মানুষ করে তোলার ব্যাপারে এই পদ্ধতির গুরুত্ব বড় কম ছিল না।

ভ্লাদিমির ইলিচ তার ব্যক্তিগত জীবনে যে-বিচক্ষণ শৃঙ্খলাবোধ ও মিতব্যয়িতার পরিচয় দিয়ে এসেছে এবং রাষ্ট্রগঠনের ক্ষেত্রে তার কমরেডদের কাছ থেকে যা-কিছু সে দাবি করেছে, সেই সবকিছুর হাতেখড়ি হয়েছে তার ছেলেবেলায়।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

১৮৮৬ সালে, ভ্লাদিমিরের যখন প্রায় ষোল বছর বয়স, তখন আমাদের সেই সুখী পরিবার প্রথম প্রচণ্ড আঘাত পেল। বাবা হঠাৎ মারা গেলেন ১২ জানুয়ারি তারিখে। আলেক্সান্দর তখন পিটার্সবুর্গে। বাড়িতে উপস্থিত ছেলেদের মধ্যে ভ্লাদিমির ছিল বয়সে সবচেয়ে বড়। কিন্তু সেই কাঁচ কিশোরবয়স সত্ত্বেও মায়ের দেখাশোনার ব্যাপারে অসম্ভব মনোযোগ দিয়েছিল সে, মায়ের গুরুভার ভাবনাচিন্তা ও দায়িত্বের বোঝা হালকা করার চেষ্টায় সবরকমে তাঁকে সাহায্য করতে এগিয়ে এসেছিল।

সেবার শীতকালে সিম্‌বির্স্কে আমি অন্যান্য বারের চেয়ে বেশি সময় থেকে যাই। কেননা ক্রিস্‌মাসের ছুটি কাটাতে এসে বাবার মৃত্যুর সম্মুখীন হতে হয় আমাকে। ওই সময়ে লাতিন ভাষায় পিছিয়ে পড়ায় ভাষাটা একটু ঝালিয়ে নিতে হচ্ছিল, আর ভ্লাদিমির ভাষাটা ভালো জানত বলে সে আমাকে সাহায্য করছিল। মাস্টার হিসেবে ও ছিল দারুণ পটু, ওর দৌলতে আমার ভাষাশিক্ষা রীতিমতো জমে উঠল, আগ্রহোদ্দীপক হয়ে উঠল ভাষাটা আমার কাছে। ও বলত, স্কুলে পাঠসূচির জন্যে বড্ড বেশি সময় দেয়া হয়েছে, একটু বয়স্ক যে-কোনো যোগ্য ছাত্র বা ছাত্রী আট বছরের জন্যে নির্দিষ্ট ওই পাঠসূচি অনায়াসে শেষ করতে পারে দু'বছরেই। আর এটা ভ্লাদিমির হাতে-কলমে প্রমাণও করেছিল ওখোত্‌নিকভ নামে এক তরুণ শিক্ষককে দু'বছরে স্কুলের শেষ পরীক্ষার জন্যে তৈরি করে দিয়ে।

ওখোত্‌নিকভ জাতিতে ছিলেন চুভাশ, চুভাশদের এক স্কুলে পড়াতেন তিনি। গণিতশাস্ত্রে তিনি রীতিমতো দক্ষ ছিলেন, অঙ্কে স্কুলের পাঠসূচি নিজের চেষ্টায় তিনি শেষ করেছিলেন। ওই সময় তিনি উচ্চতর গণিত নিয়ে পড়তে চাইছিলেন, কিন্তু এজন্যে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হতে হলে তাঁর পক্ষে গ্রীক ও লাতিন ভাষা সহ স্কুলের সবকটি বিষয়ের শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া দরকার ছিল।

স্বভাবতই রুশ ভাষায় স্বল্প জ্ঞান নিয়ে কোনো চুভাশের পক্ষে এ-কাজটা সম্পন্ন করা সহজ ছিল না। তার ওপর আবার ভাষা আর সমাজ-বিজ্ঞান আয়ত্ত করার ব্যাপারে ওখোত্‌নিকভের স্বাভাবিক প্রবণতাও ছিল কম। তা সত্ত্বেও চুভাশ-স্কুলটির পরিদর্শক ও আমাদের পরিবারের এক ঘনিষ্ঠ বন্ধু ইয়াকভ্‌লেভ প্রস্তাব করলেন যে ভ্লাদিমির যদি ওখোত্‌নিকভকে স্কুলের শেষ পরীক্ষার জন্যে তৈরি করে দেয় তো ভালো হয়। ভ্লাদিমির এ-প্রস্তাবে রাজি হয়ে গেল এবং সেই দুই

বছর স্কুলে সবচেয়ে উ'চু দুই ক্লাসের ছাত্র হিসেবে তার নিজের পড়াশুনোর চাপ সত্ত্বেও দেড় বছরের অল্প একটু বেশি সময়ের মধ্যে ওখোত্‌নিকভকে সে স্কুল-ফাইন্যাল পরীক্ষার জন্যে তৈরি করে দিল। ফলে ভ্লাদিমিরের সঙ্গে একই বছরে ওখোত্‌নিকভও স্কুলের পরীক্ষায় পাশ করে বিশ্ববিদ্যালয়ে ঢুকলেন। এ-প্রসঙ্গে বলা দরকার যে ওখোত্‌নিকভকে সাহায্য করা বাবদ কোনোদিন একটি পয়সাও নেয় নি ভ্লাদিমির।

১৮৮৭ সালে ভ্লাদিমির যখন স্কুলের সর্বোচ্চ শ্রেণীতে পড়ছে তখন আমাদের পরিবারে ফের একবার প্রচণ্ড আঘাত লাগল। জার তৃতীয় আলেক্সান্দরকে হত্যা করার চেষ্টায় অংশ নেয়ার অভিযোগে সেণ্ট পিটার্সবুর্গে গ্রেপ্তার হল আমাদের বড় ভাই আলেক্সান্দর।

ভ্লাদিমিরই প্রথম এই মর্মান্তিক খবরটা পেল, মা-কে এই আঘাতের জন্যে তৈরি করার ভারও নিতে হল তাকেই।

ব্যাপারটা ঘটেছিল এইরকম:

আমাদের এক আত্মীয় সিম্‌বির্স্কে আমাদের পরিবারের বন্ধু স্কুলশিক্ষিকা কাশ্‌কাদামভাকে চিঠি লিখে জানিয়েছিলেন যে আলেক্সান্দর আর আমি গ্রেপ্তার হয়েছিল। মা-কে এই আঘাতের জন্যে তৈরি করার ভারও তিনি দিয়েছিলেন আমাদের বন্ধুটির ওপর।

এ-প্রসঙ্গে কাশ্‌কাদামভা লিখছেন: 'চিঠিখানা পেয়ে আমি ভ্লাদিমিরকে স্কুল থেকে ডেকে পাঠালাম। ও এলে চিঠিখানা পড়তে দিলাম ওকে। ভ্রু-দুটো কুঁচকে, গভীর চিন্তায় ডুবে অনেকক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল ভ্লাদিমির। আমার এতদিনের চেনা সেই হাসিখুশি বাচ্চা ছেলে বলে ওকে তখন মনে হল না, মনে হল আমার সামনে দাঁড়িয়ে আছে এক পোড়-খাওয়া বয়স্ক লোক। ও শুধু বলল: 'আলেক্সান্দরের পক্ষে ব্যাপারটা খুবই গুরুতর হয়ে দাঁড়াবে মনে হচ্ছে'।'

ব্যাপারটা সত্যিই খুব গুরুতর হয়ে দাঁড়িয়েছিল। আলেক্সান্দর জারের হত্যা-প্রয়াসের অন্যতম নেতা ছিল বলে প্রমাণ হল আর প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হল সে। ১৮৮৭ সালের ৮ মে তার প্রাণদণ্ড কার্যকর হল।

এই মর্মভুদ বিচ্ছেদ-বেদনাকে অত্যন্ত ধীরস্থিরভাবে গ্রহণ করল ভ্লাদিমির, পড়াশুনো চালিয়েও গেল যথারীতি, কিন্তু আগের চেয়ে অনেক বেশি দায়িত্বশীল হয়ে উঠল ও চুপচাপ হয়ে গেল। প্রায়ই সে তখন ভাবত, তার দাদা সম্ভবত সংগ্রামের সঠিক পথ বেছে নেয় নি। বলত: 'আমরা এ-পথে যাব না। এটা ঠিক পথ নয়।'

আলেক্সান্দরের মতো অমন একজন 'জঘন্য অপরাধী'কে স্বর্ণপদক আর প্রথম শ্রেণীর সার্টিফিকেট পুরস্কার হিসেবে দেয়ায় সিম্‌বির্স্কের স্কুল-কর্তৃপক্ষ তিরস্কৃত হন। মনে হল যে আলেক্সান্দরের ভাই ভ্লাদিমিরকে অন্তত স্বর্ণপদক পুরস্কার দেয়া হবে না, কিন্তু স্কুলের আট বছরের পড়াশুনোয় ভ্লাদিমিরের সাফল্য ছিল এত অসামান্য এবং স্কুল-ফাইন্যাল পরীক্ষায় তার উত্তরপত্রগুলি ছিল এমনই চমৎকার যে তাকে স্বর্ণপদক না-দেয়া একেবারে অসম্ভব হয়ে দাঁড়াল। এমনকি পরে ওলিয়াও স্কুল শেষ করার পর স্বর্ণপদক পেয়েছিল। স্বর্ণপদক অর্জনের সাফল্য সহ স্কুলের পাঠ শেষ করার পর ভ্লাদিমির ভর্তি হল কাজান বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন-বিভাগে।

মা তাঁর সিমবির্স্কের বাড়ি আর যা-কিছু অপ্রয়োজনীয় বলে মনে করলেন সে-সমস্তই বিক্রি করে দিয়ে ছেলেমেয়েদের নিয়ে বাস উঠিয়ে চলে এলেন কাজানে।

১৮৮০-র দশকের সূচনা থেকেই দেশে ছাত্র-নির্যাতন অসহনীয় হয়ে উঠেছিল, ১৮৮৭ সালের ১ মার্চ তারিখে ছাত্র সহ একদল গুপ্ত বিপ্লবী জারের প্রাণনাশের চেষ্টা করার পর এই নির্যাতনের মাত্রা সাংঘাতিক বৃদ্ধি পেল। পুলিসের গুপ্তচরদের নিযুক্ত করা হল 'ছাত্র-পরিদর্শক' হিসেবে; ছাত্রদের সর্বপ্রকার সংঘ-সমিতি, এমনকি সবচেয়ে নির্দোষ সংগঠনগুলিও, ভেঙে দেয়া হল, তাদের সব রকমের সংগঠন দেয়া হল বন্ধ করে এবং বহু ছাত্রকে হয় গ্রেপ্তার আর নয়তো শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলি থেকে বহিষ্কৃত করা হল।

ফলে ছাত্রছাত্রীরা প্রতিবাদ জানাল সবক'টি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। ছাত্র-বিক্ষোভ ফেটে পড়ল কাজান বিশ্ববিদ্যালয়েও।

নিষিদ্ধ এক ছাত্র-সমাবেশে যোগ দেয়ার অভিযোগে ভ্লাদিমিরও বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিষ্কৃত হল। তাকে অন্তরীণ করে রাখা হল কোকুশ্‌কিনো গ্রামে।

বিশ্ববিদ্যালয়ে ভ্লাদিমিরের ছাত্রজীবনের অবসান ঘটল এই বহিষ্কারের ফলে। দেশের সবক'টি বিশ্ববিদ্যালয়ের দরজাও তার সামনে বন্ধ হয়ে গেল।

ফের তাকে বিশ্ববিদ্যালয়ে গ্রহণ করবার জন্যে বারবার আবেদন জানাল সে, কিন্তু প্রধানত আলেক্সান্দর উলিয়ানভের ভাই বলেই তার সবক'টি দরখাস্ত না-মঞ্জুর হল।

এইভাবে মাত্র সতেরো বছর বয়সে ভ্লাদিমিরের আনুষ্ঠানিক ছাত্রজীবনের অবসান ঘটল। তবু নিজের দৃঢ় সংকল্পের জোরে অন্যের সাহায্য ছাড়াই সে বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠক্রম সম্পূর্ণ করতে পেরেছিল।

শেষপর্যন্ত আইন-বিভাগের পরীক্ষাগুলি তাকে দিতে দেয়ার পরই ভ্লাদিমিরের
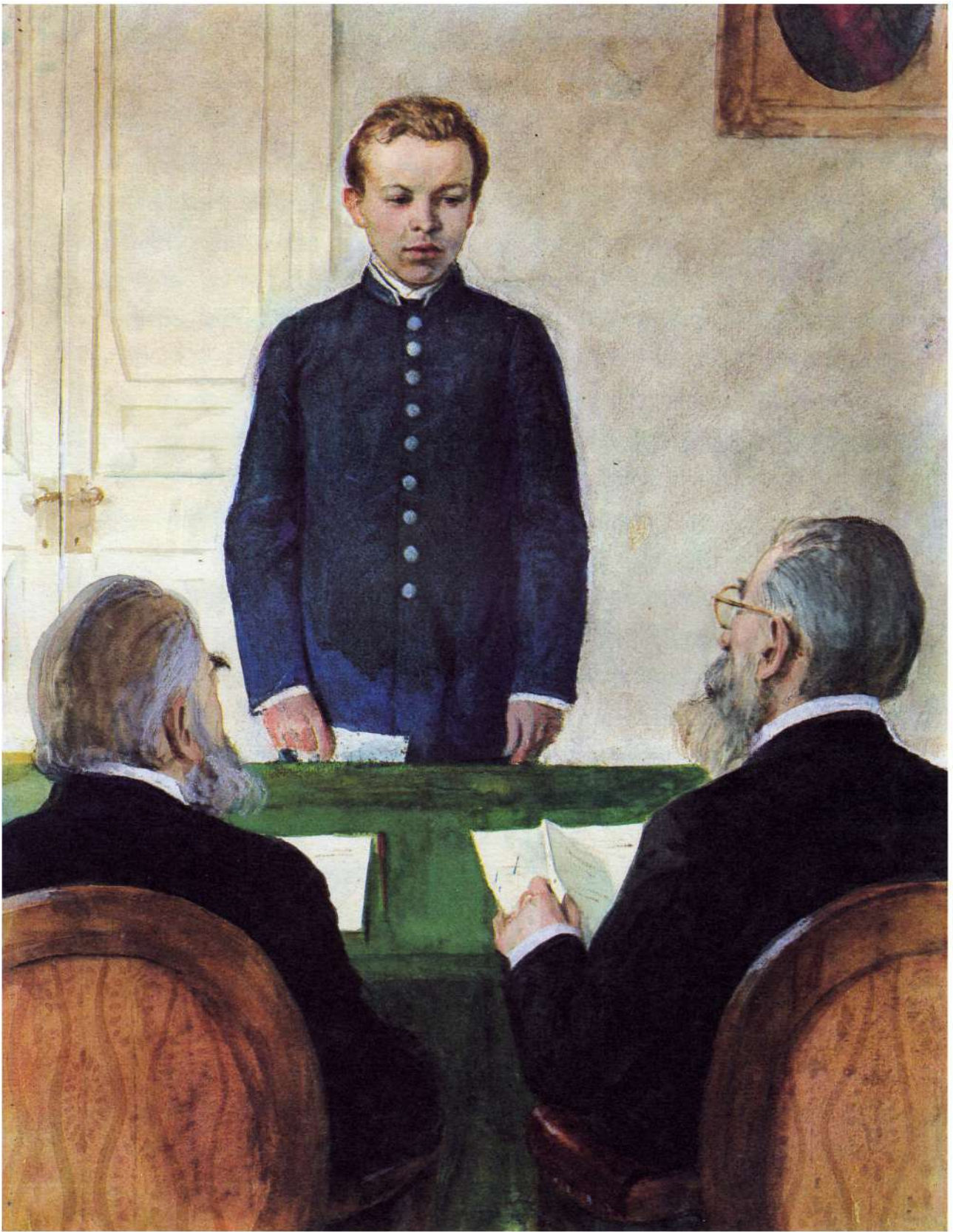
আনুষ্ঠানিক শিক্ষালাভের পালা চুকল। এক্ষেত্রে উল্লেখ্য এই যে সে তার নিজের ক্লাসের ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গেই আইন-বিভাগের শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়, অর্থাৎ ব্যাপারটা ঘটল এমন যেন সে কোনোদিনই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিষ্কৃত হয় নি।

সে-সময়ে অনেকেই এটা দেখে আশ্চর্য হয়েছিলেন যে জীবনে পরপর এতগুলো ধাক্কা সামলাতে হওয়া সত্ত্বেও ভ্লাদিমিরের একটা পাঠবর্ষও নষ্ট হয় নি। বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্পূর্ণ পাঠক্রম নির্দিষ্ট চার বছরে শেষ করার পরিবর্তে সে তা শেষ করে প্রায় দু'বছরের মধ্যেই।

আইনের স্নাতক-ডিগ্রি ছিল আইনজীবীর পেশা অবলম্বনের চাবিকাঠি (ভ্লাদিমিরও তাই সহকারী ব্যারিস্টর-অ্যাট-ল পদের জন্যে দরখাস্ত পেশ করে) এবং জীবিকানির্বাহের উপায়ও। এটা ছিল একটা জীবনমরণ সমস্যা, কেননা আমাদের গোটা পরিবার তখন মায়ের পেন্সনের টাকায় আর বাবার মৃত্যুর পর সামান্য যা সম্পত্তি আমাদের থেকে গিয়েছিল তার ওপর নির্ভর করে চলছিল।

ওই সময়ে কয়েক বছরের মধ্যেই প্রথমে কাজানে ও পরে সামারায় থাকতে ভ্লাদিমির হয়ে ওঠে একনিষ্ঠ ও পাকাপোক্ত বিপ্লবী, সকল বিপদ-আপদে নির্ভীক এবং শ্রমিক শ্রেণীর স্বার্থে সম্পূর্ণত সমর্পিতপ্রাণ।

মার্কস-এঙ্গেলসের রচনাবলি গভীরভাবে অধ্যয়ন করে ভ্লাদিমির। মার্কস ও এঙ্গেলসই দেখান যে সকল দেশের পুঁজিপতিরা শ্রমিকদের ওপর নিপীড়ন চালাচ্ছে ও শ্রমিকদের হাড়মাস শুষে আহরণ করছে বিপুল সম্পদ এবং ভূস্বামীরা ধনী হয়ে উঠছে কৃষকদের শ্রমের ফল আত্মসাৎ করে। মার্কস ও এঙ্গেলস লিখেছেন যে সকল প্রকার শোষণ ও উৎপীড়নের অবসান ঘটানোর একটিমাত্রই পথ আছে আর তা হল শ্রমিকদের ঐক্যবদ্ধ হওয়া এবং সকল শ্রমজীবীর সম্মিলিত প্রয়াসে ভূস্বামী ও পুঁজিপতিদের শাসনকে উচ্ছেদ করা, নিজেদের হাতে শাসনক্ষমতা গ্রহণ করা, নতুন এক সমাজ-ব্যবস্থার প্রবর্তন ঘটানো ও সকল মানুষের জীবন সুখময় করে তোলা।

যেখানে অনেক কলকারখানা আছে এমন কিছু-কিছু দেশে সম্মিলিত শ্রম ও দুঃখস্বীকারের মধ্যে দিয়ে ঐক্যবদ্ধ শ্রমিকরা তখনই তাদের অধিকার অর্জনের লড়াই শুরু করে দিয়েছিল। কিন্তু সেকালে রাশিয়ায় ছিল নামমাত্র কিছু কলকারখানা, শ্রমিকরা ছিল অজ্ঞ এবং তাদের মধ্যে অল্প কিছু লোকই ছিল শ্রেণী-সচেতন। শ্রমজীবী জনসাধারণকে পদানত করে রাখার জন্যে ভূস্বামী ও পুঁজিপতিদের সর্বপ্রকারে সাহায্য করত তখন জার ও তার অধীনস্থ শাসনকর্তারা। কিন্তু লেনিন ঠিক বুঝেছিল যে রাশিয়াকেও মার্কস ও এঙ্গেলসের নির্দেশিত পথ

অবলম্বন করতে হবে। শ্রমিকদের ঐক্যবদ্ধ হতে সাহায্য করেছিল লেনিন, প্রতিষ্ঠা করেছিল শ্রমিক শ্রেণীর স্বার্থে সংগ্রামরত যোদ্ধাদের মধ্যে সবচেয়ে জঙ্গী অগ্রগামীদের পার্টি, কমিউনিস্ট পার্টির।

বহু দীর্ঘ সময় ধরে রাশিয়ার শ্রমিক শ্রেণী নাছোড়বান্দাভাবে একটানা বৈপ্লবিক সংগ্রাম চালিয়ে যায়। আর ১৯১৭ সালের অক্টোবর মাসে কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে পরিচালিত ও কৃষক-সম্প্রদায়ের অগ্রভাগে থেকে যুদ্ধরত শ্রমিক শ্রেণী শাসনক্ষমতা দখল করে নেয় এবং এখন ওই শ্রেণী সকল মানুষের জন্যে স্বাস্থ্য, সুখ ও সমৃদ্ধিতে পূর্ণ এক জীবন গঠন করে চলেছে।

আজ লেনিনের নাম সারা বিশ্ব জুড়ে লক্ষ লক্ষ শ্রমজীবী মানুষের কাছে পরম প্রিয়। কেউ কোনোদিন ভুলবে না লেনিনকে।